যায়যায়দিন

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা: আধুনিকায়ন ও সমন্বিতকরণ

ড. মাহরুফ চৌধুরী

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের চলমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যতো কথাই হোক না কেন, এটা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তবু গত তিন দশক ধরে ভাষ্যকারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নানা রকমের মন্তব্য শোনা গেছে। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আবারো মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নানা রকম নেতিবাচক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এখানে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে সমন্বিতকরণ নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার আগে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীই উপমহাদেশে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য সর্বপ্রথম যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, সেটা ছিল কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই এর প্রথমদিককার প্রিন্সিপাল ও শিক্ষক ছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য হলো, আলিয়া মাদ্রাসা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল উপনিবেশিক শাসনামলে এবং এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল মূলত বৃটিশরাই। আর কওমি মাদ্রাসা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে উপমহাদেশে বৃটিশবিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও আন্দোলনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। এ স্বল্প পরিসরে সেসব ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করার তেমন সুযোগ নেই। তবে এ কথা না বললেই নয় যে, ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মডেলেই পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের আলিয়া মাদ্রাসা নামের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। এ আলিয়া মাদ্রাসাকে আধুনিকায়নের জন্য যদিও পরবর্তী সময়ে নিউ স্কিম মাদ্রাসা নামে এক ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটা তেমন সাফল্য লাভ না করায় বিকশিত হতে পারেনি।

উপমহাদেশের মুসলমানদের খুশি করা ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের অথর্ব করে গড়ে তোলার জন্যই মূলত ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজটি করেছিল। তারপরও অতীতে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিরা সমাজে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নাম শুনলে অনেকেই অবাক হবেন যে, দেশবরেণ্য অনেক ব্যক্তিই দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা থেকেই আগত এবং জাতীয় উৎকর্ষে নিজেদের বিকশিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশেষ অবদান রেখেছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত সেসব উল্লেখযোগ্য প্রথিতযশা গুণীজন হলেন- সুরকার ও তার্কিক মুন্সী মেহের উল্লাহ, মওলানা ভাসানী, শেখ আবদুর রহিম, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিম, খানবাহাদুর আবদুর রহমান খান, মওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বিজ্ঞানী ড. শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমমানের বিষয়ে এখন আর আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে কওমি মাদ্রাসা উপব্যবস্থা এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও কোনো পর্যায়েই সমমানপ্রাপ্ত নয়। তাই এখানে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাকাল সর্বমোট ১৩ বছর। সাধারণ কওমি মাদ্রাসাগুলোতে ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে পরবর্তী ৯ বছর ধরে আরবি ব্যাকরণ, আরবি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, আল কোরআন (তরজমা ও তাফসির), আল হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতি পড়ানো হয়ে থাকে। কোনো কোনো কওমি মাদ্রাসায় এ স্তরে নিজস্ব শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার পঞ্চম শ্রেণী, কোথাও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং কোনো কোনো মাদ্রাসায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়গুলো, বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও ভূগোল পড়ানো হয়ে থাকে।

সাধারণ দেশের মাদ্রাসাগুলো সমাজের নানা স্তরের সাধারণ মানুষের দানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। দেশে শুধু দুটি আলিয়া মাদ্রাসা সম্পূর্ণ সরকারি খরচে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ মাদ্রাসা দুটি হলো ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা। সাধারণত দেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সাধারণ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে থাকে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বিরাট অংশ আবার এতিম। এদের জন্য মাদ্রাসাগুলো যেসব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, সেটাই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া একশ্রেণী বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে পাঠান পরকালীন মুক্তির আশায়। ধর্মীয় শিক্ষা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার জন্যই ধর্মপ্রাণ মানুষের শ্রমে আর অর্থে এ দেশের

স্বীকৃতি দেয়নি, তাই সরকারের কাছে কওমি মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে কোনো রকম তথ্য নেই। তার মানে এই নয় যে, কওমি মাদ্রাসাগুলো তাদের হিসাব দিতে চায় না কিংবা তারা গোপনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার কখনই কওমি মাদ্রাসাগুলোর কাছে কোনো রকম হিসাব-নিকাশ চায়নি। বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান ব্যানবেইস ইচ্ছা করলেই এক সপ্তাহের মধ্যে এ হিসাব নিতে পারে। নিতে পারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০০৬ সালে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবি আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের পক্ষ থেকে যে হিসাব জমা দেয়া হয়, তাতে দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫ হাজার ২৫০ বলে উল্লেখ করা হয়। সে হিসাবে আরো বলা হয়, মাদ্রাসাগুলোতে কর্মরত আছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ১৫০ জন শিক্ষক এবং অধ্যয়নরত আছে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে ব্যানবেইসকে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কওমি মাদ্রাসাগুলোর হিসাব সংগ্রহ করার নির্দেশ দিতে পারে। এতে ব্যানবেইস বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভৌগোলিক মানচিত্রে সহজেই কওমি মাদ্রাসাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে। শিক্ষা প্রশাসন যেমন এ তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারে, তেমনি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাও সহজে নজরদারি করতে পারবে এদের কার্যক্রমের ওপর।

২০০৬ সালে শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের চুক্তি করেছিলেন, তখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, মহাজোট ক্ষমতায় গেলে কওমি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়া হবে। যদিও পরবর্তী সময়ে এ চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল, তবু বাস্তবতা ও রাজনৈতিক সমন্বিত করা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রথম বছর তারা প্রাথমিক স্তরের (প্রথম-অষ্টম শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পুনর্গঠন করবে। যখন এ কাজ সম্পন্ন হবে, তখন তারা প্রাথমিক স্তরের সমমান পাবে। দ্বিতীয় বছর তারা মাধ্যমিক স্তরের (নবম-দশম শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পুনর্গঠন করে সাধারণ শিক্ষাস্তরের সঙ্গে সমন্বিত করবে। যখন এ কাজ সম্পন্ন হবে, তখন সরকার, কওমি মাদ্রাসার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরকে স্বীকৃতি দেবে। তারপর তৃতীয় বছর তারা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (১১তম-১২তম শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্গঠন করবে। সমান্তরালে কওমি মাদ্রাসা বোর্ড এবং মাদ্রাসাগুলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তাদের অধিভুক্তি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নিয়ে কাজ করবে, যাতে করে চতুর্থ বছর থেকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সরাসরি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে তাদের স্নাতক কোর্স পরিচালনা শুরু করবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি ও সমমান প্রদানের জন্য যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, তা হলো দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো ২০০৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিবন্ধিত করা। সেটা করা সম্ভব হলে কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সহজেই তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের আওতায় আনা যাবে। কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাশাপাশি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে কিছু দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে মিল রেখে অর্থোপার্জনকারী (Income Generating) বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা উপার্জনক্ষম হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

দেশে একটি সরকারি ও দুটি বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তাই নতুন করে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত, তা সরকারকে বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমাদের দেশে প্রায়ই সরকার তুঘলকি কাণ্ড করে বসে, যে রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকুক না কেন। রাতারাতি কোনো কিছু করে ফেলার মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয় করার আগে প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। শুধু রাজনৈতিক ও গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থে জনগণের অর্থ ব্যয় করে নতুন একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে যেসব মাদ্রাসায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ওপরে কোর্স চালু আছে, সেগুলো দেশের তিনটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো একটির সঙ্গে অধিভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। সরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন সারাদেশের ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রায় দেড় হাজার আলিয়া মাদ্রাসার দায়িত্ব নিয়েছে। তেমনি বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব

> বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলা ও প্রতিটি মাদ্রাসায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে সমন্বিত করতে শিক্ষাক্রম নবায়নে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আর তা করা সম্ভব হলেই কেবল সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার অঙ্গীকার

তারিখ 10 OCT 2009 পৃষ্ঠা ...